22/8/2000

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একটি শিক্ষানীতির আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

ড. মোহাম্মদ হাননান

(গত সংখ্যার পর)

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ও শিক্ষক নির্বাচন কমিশন

☐ প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত রাখা হয়েছে ১ : ৪০। তবে বৃত্তি বা কারিগরি শিক্ষায় এ অনুপাত হবে ১ : ১২ [পৃষ্ঠা-১১]। আর দুটো স্তরেই 'সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন' করার প্রস্তাব করা হয়েছে। [পৃষ্ঠা ৪, ৫ , ৯]। অর্থাৎ এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ন্যায় শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করার বহুদিনের দাবি বাস্তবায়ন লাভ করবে। বিশেষ করে দেশ-গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিটির জবাবদিহিতা

☐ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ব্যবস্থাপনা কমিটিরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুপারিশ রাখা হয়েছে জাতীয় শিক্ষনীতি ২০০০-এ, এমনকি পড়াশুনার বিষয়টি মনিটরিং করতে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি করারও প্রস্তাব এতে করা হয়েছে [পৃষ্ঠা-৪]

পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন

☐ নতুনভাবে সাজানোকৃত শিক্ষা নীতিমালায় নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী 'মাধ্যমিক শিক্ষা' বলে পরিচিত হয়েছে। দশম শ্রেণীতে কোন পাবলিক পরীক্ষা নেই। (তবে বৃত্তি পরীক্ষা হবে), পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে.৮ম শ্রেণীর পর দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে। এতে মেধা তালিকা থাকবে না। ফলও নির্ধারিত হবে গ্রেডিং সিস্টেমে [পৃষ্ঠা ৮, ৯]। যারা এ-গ্রেড পাবে আমেরিকান পদ্ধতির মতো তাদেরকে 'মেধা সমাজ' স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ রয়েছে। [পৃষ্ঠা-৩৫]। পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির এ রীতি কার্যকর হলে শিক্ষানুরাগী শিক্ষাবিদদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে।

অভিন্ন শিক্ষাক্রম

☐ সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা এবং কারিগরি শিক্ষা ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হবে [পৃষ্ঠা-৮]।

☐ হাইস্কুলগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হবে, আবার উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলো খুলবে নবম ও দশম শ্রেণী [পৃষ্ঠা-৮]।

মাদরাসা শিক্ষা

☐ মাদরাসার ছাত্ররা এবতেদায়ির ৮ম শেষ করে সাধারণ শিক্ষার নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। আবার আলেম শ্রেণী শেষ করে সাধারণ ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হতে পারবে। অর্থাৎ এক ধারা থেকে অন্য ধারায় গমনের পথ খোলা থাকবে। [পৃষ্ঠা-৮]।

☐ মাদরাসার ফাজিল, কামিল পর্যায়ের সার্বিক দায়িত্ব নেয়ার জন্যে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয়েছে। [পৃষ্ঠা-১৩]

উচ্চশিক্ষা নীতিমালা

☐ বিভিন্ন কোর্সে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে সাধারণ শিক্ষাধারার ডিগ্রী কোর্স তিন বছর, অনার্স চার বছর, মাদরাসার ফাজিল তিন বছর করার প্রস্তাব রয়েছে। [পৃষ্ঠা-১২, ১৫]

☐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যে স্বশাসন ব্যবস্থার অপরিহার্যতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে, তবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা শুধু সে বিষয়ে সরকারি মনিটরিং ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে [পৃষ্ঠা-১৪]।

☐ উচ্চশিক্ষার নীতি হিসেবেই বলা হয়েছে, বিজ্ঞানমনস্ক ও অসাম্প্রদায়িক নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা এবং অবাধ বুদ্ধিচর্চা ও প্রগতির অনুযায়ী হিসেবে তার বিকাশকে লালন করা। [পৃষ্ঠা-১৫]

☐ উচ্চশিক্ষায় অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হবে। ছাত্রছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ দেয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে শিক্ষানীতিতে [পৃষ্ঠা-১৬]।

☐ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই উপযুক্ত মানের হতে হবে। কোনোভাবেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠান করা যাবে না এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী হতে পারবে না [পৃষ্ঠা-১৭]

বিজ্ঞান ও প্রকৌশল

☐ প্রকৌশল শিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময় অর্থনীতি, সমা বিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্যমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপরও জোর দেয়া হবে। অন্যদিকে চিকিৎসা শিক্ষার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী যাতে সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন তার জন্যে উদ্বুদ্ধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। [পৃষ্ঠা-১৮]

☐ বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়টি জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেখা হয়েছে সম্পূর্ণই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্কুল থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হবে, তবে শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতির ঘটনামালা ও সহজ নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে।

☐ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও একটি মৌলিক বিষয় উত্থাপন করেছে জাতীয় শিক্ষানীতি। বলা হয়েছে, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার যে পারস্পরিকতা ও পরিপূরকতা আছে তা উপলব্ধি করে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অংশরূপে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রক্রিয়া চলবে'। [পৃষ্ঠা-২০] বস্তুত বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদনের এ অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর এর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিজ্ঞান বেরিয়ে আসবে 'যন্ত্র' থেকে। আর এ কাজটি ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষানীতিতে 'সম্ভাব্য সকল স্থানে বিজ্ঞান কেন্দ্র' গড়ে তোলার কথাও উল্লেখ করেছে। [পৃষ্ঠা-২০]

☐ এই প্রেক্ষাপটেই কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার বিষয়টি জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভিন্নকরণের গুরুত্ব পেয়েছে। জেলা ও উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে একে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে [পৃষ্ঠা-২২]। ১২টি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি নামে নতুন বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়েছে।

বিজনেস, কৃষি ও নারী শিক্ষা

☐ জাতীয় পরিকল্পনায় ও সম্পদ বণ্টনে কারবার (বিজনেস) শিক্ষাখাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে। [পৃষ্ঠা-২৪]

☐ কৃষি শিক্ষাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ কাজে এ খাতকে কাজে লাগানোর সুপারিশ রয়েছে শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে। [পৃষ্ঠা-২৫]

☐ এভাবে ললিতকলা, আইনশিক্ষা, বিশেষ করে নারী শিক্ষা আলাদা মর্যাদা লাভ করেছে সমগ্র প্রতিবেদনে। নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতেই নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তির বিষয়গুলো আনার কথা বলা হয়েছে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়। মহীয়সী নারীর জীবনী এবং নারীদের বিভিন্ন লেখা-নিবন্ধও পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। [পৃষ্ঠা-২৯]

ফেলের হার কমানো প্রসঙ্গে

☐ পাবলিক পরীক্ষায় ফেলের হার কমানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে শিক্ষানীতিতে। শিক্ষানীতির সুপারিশ কার্যকর হলে ছাত্ররা এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে শুধুমাত্র ওই এক বা দুই বিষয়েই দু বার করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করার সুযোগ হবে। [পৃষ্ঠা-৩৪]

☐ যে কোন ভর্তি পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কোড পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। [পৃষ্ঠা-৩৬]

বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, নিরাপত্তা ও পদোন্নতি

☐ বেসরকারি শিক্ষকদের প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে বেতনের ১০০% সরকার থেকে প্রদানের উল্লেখ রয়েছে এ প্রতিবেদনে। [পৃষ্ঠা-৪১]। এর ফলে এ বিষয়টি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের বিতর্ক ও অপেক্ষার অবসান ঘটবে। পরীক্ষায় শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিষয়ে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষকতার মান বিবেচনায় নিয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। তবে শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করার জন্যে শিক্ষক সংগঠনগুলোর কাছেই উদ্যোগী ভূমিকা আশা করা হয়েছে। [পৃষ্ঠা-৪২]

☐ যেসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি বেতন আদায় করা হয় তাদের সরকারের খাত থেকে আর বরাদ্দ না দেওয়ার সুপারিশ রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এ। [পৃষ্ঠা-৪২]

শিক্ষার জন্য অর্থায়ন

☐ শিক্ষার জন্যে অর্থায়নের বিষয়টি বিদগ্ধজনের কৌতূহল মেটাতে সমর্থ হবে। আগামী ১২ বছরে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করবে এবং এতে মোট বর্ধিত খরচ হবে ৩০,০০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে শিক্ষাখাতে সমগ্র সরকারি ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ৪ শতাংশ হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য একটু বেশি ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ২.৬৭ শতাংশ করার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। [পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪]

শেষ করার পূর্ব কথা

১৯৪৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের আমলে নানারকম শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও এগুলি প্রণয়ন করেছিলেন দেশের শিক্ষাবিদরাই। যেমন—১৯৭৪ সালের বঙ্গবন্ধুর সরকারের শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কুদরত-ই-খুদা নিজেই ছিলেন দেশের বিজ্ঞানী। কমিশনের অন্যান্য সদস্য ছিলেন প্রফেসর কবীর চৌধুরী, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, ড. আনিসুজ্জামান প্রমুখ।

১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় তাতে সদস্য ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, ড. মোহাম্মদ সেলিম, ড. আল-মুতী শরফুদ্দীন, আতাউস সামাদ, ড. সৈয়দ শফিউল্লাহ প্রমুখ।

১৯৮৮ সালে জেনারেল এরশাদের আমলে প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাতে সদস্য ছিলেন কাজী ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ড. আল-মুতী শরফুদ্দিন প্রমুখ।

১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রফেসর শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে যে শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় তাতে সদস্য ছিলেন প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ, ড. আল-মুতী শরফুদ্দীন, ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন, প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর আলমগীর মো. সিরাজউদ্দিন, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, ড. আলী আসগর, ড. কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

এদের নাম বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই দেশে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাবিদ। তাঁরাই শিক্ষানীতির সুপারিশমালা অতীতে তৈরি করেছেন। এমনকি পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালে শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছিল তাও প্রণয়ন করেছিল শিক্ষাবিদগণই। সেদিন যে বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রধানভাবে ছাত্রনেতারা আন্দোলনের সূচনা করেছিল তার অন্যতম বিষয় ছিল, ডিগ্রি কোর্স দুই বছর থেকে তিন বছর করার বিরোধিতার প্রসঙ্গটি। এটি প্রমাণিত হয়েছে, আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এ বিষয়কে বেছে নেওয়া ছিল আত্মঘাতী। চল্লিশ বছর পর ছাত্ররাই আবার এখন দাবি তুলেছে ডিগ্রি কোর্স তিন বছর করা হোক, দুই বছরের ডিগ্রি কোর্স আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয় বলে বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের ছাত্রদের নতুন করে আবার কোর্সটি সম্পন্ন করতে হচ্ছে। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের জন্যে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের অন্য আর কোন বিষয় বেছে নেয়া উচিত ছিল।

শিক্ষানীতি বিষয়ে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রসঙ্গেই আরও দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ দেশের ছাত্ররা একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু তারা তা পায়নি। আবার অনেক শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা যে আন্দোলন করেছে তার যে সবটা তারা বুঝে করেছে এমনও নয়। বিভিন্ন সময়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে রাজনৈতিক নেতারা সবসময়ই ছাত্রদের প্রভাবিত করেছেন। অনেক সময় সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন শুরু করার জন্য শিক্ষা বিষয়কে নেতারা মূলধন হিসেবে ব্যবহার করছেন। এটা আইয়ুবের সামরিক শাসনের সময়ও ঘটেছে, জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের সামরিক শাসনের সময়ও ঘটেছে. শিক্ষানীতি নিয়েই প্রথম বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছিল এ সময়কালগুলোতে।

অতীতের সকল শিক্ষা কমিশন রিপোর্টই শতকরা একশ ভাগ খারাপ ছিল এমন নয়, হয়তো পাঁচ বা দশ ভাগ খারাপ বা বিতর্কিত বিষয় তাতে ছিল. নব্বই-পঁচানব্বই ভাগ হয়তো ভাল ছিল। কিন্তু পাঁচ বা দশ ভাগ খারাপকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল সামরিক শাসনকে কুপোকাত করার জন্য। এর ফলাফলটা কী! ফলাফলটা হলো পাঁচ-দশ ভাগ মন্দের জন্য আমরা পুরো রিপোর্টকেই প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলাম। ফলে দীর্ঘদিন থেকে এ দেশে কোনো শিক্ষানীতি নেই। শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা তো অলৌকিক কিছু বয়ে আনবে না, আজকে শিক্ষায় যে সংকট চলছে তা এটারই একটি প্রতিফলনমাত্র।

মাঝে মাঝে এমন মনে হয় কিনা, শাসকরাই ইচ্ছে করে ওই পাঁচ-দশ ভাগ মন্দ বা বিতর্কিত বিষয় রিপোর্টসমূহে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যাতে নব্বই ভাগ বাস্তবায়ন তাদের না করতে হয়। তারাই হয়তো মনে মনে কামনা করে ছাত্ররা এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুক, আর তারাও সুযোগ বুঝে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের স্থগিত করে দেয়, অথবা পুরো রিপোর্টই পুরোপুরি বাতিল বলে ঘোষণা করে দেয়।

ইতিহাসের এ প্রসঙ্গ উত্থাপন কেন? উত্থাপন এ জন্য যে আজকেও একটি শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর সবটাই সকলের কাছে পছন্দ হবে তা নয়। বিভিন্ন রকম মতামত এরপরও থাকতে পারে। তা থাকুক। কিন্তু মাত্র পাঁচ-দশ ভাগ মতভেদের জন্য যেন আমরা নব্বই ভাগ ঐকমত্যকে ফেলে না দেই। এবার যদি কোন শিক্ষা আন্দোলন সংঘটিত হয়, তাহলে তা যেন হয় রিপোর্ট দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি আন্দোলন। কোনো অজুহাতে কেউ যেন এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন থেকে সরে যেতে না পারে।

উপসংহার : বাঙালি জাতি গত ৫০ বছর ধরে বেড়ে উঠেছে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ছাড়াই। এটা ঠিক, কোন একটি শিক্ষানীতি কেন, কোন মতামত বা সুপারিশই একশ জনের নিরঙ্কুশ ঐক্যে সম্ভব নয়। গোষ্ঠী, দল, সংগঠন ভেদে প্রতিটিতেই রয়েছে একের থেকে অপরের নানারকম ভিন্নতা। কিন্তু শিক্ষানীতি বিষয়ে অন্তত বিবেচনায় নিতে হবে দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে, দেখতে হবে মৌলিক বিষয়গুলো এবং যতোটা সম্ভব উদারভাবে কতোটা গ্রহণ করা যায়—এ মনোভাবটাই থাকবে প্রধানভাবে।

অপেক্ষাকৃত ভাল পরামর্শ থাকলে তার জন্যে জনমত গড়ে তুলতে হবে সবাই মিলে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর ভূমিকাতেও উল্লেখ করা হয়েছে, 'দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোন নীতিই চিরকালীন, স্থির, অবিচল ব্যাপার হয় না, হওয়া উচিত নয়। সময় ও অবস্থা বিবেচনায় অন্য নীতির মতো শিক্ষানীতিতেও প্রয়োজনীয় রদবদলের সুযোগ থাকবে।' তাই পুরো সুপারিশমালা ঢালাও প্রত্যাখ্যান বা নাকচ করার মানসিকতা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে, আর এভাবেই গড়ে উঠবে অন্তত শিক্ষার প্রতি আমাদের ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ।